প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্‌

আমার ঘটনাটা কেউ বিশ্বাস করবে বলে বিশ্বাস হয় না। না করুক—তাতে কিছু এসে যায় না। নিজে চোখে না দেখা অবধি অনেকেই অনেক কিছু বিশ্বাস করে না। যেমন ভূত। আমি অবিশ্যি ভূতের কথা লিখতে বসিনি। সত্যি বলতে কী, এটাকে যে কীসের ঘটনা বলা চলে সেটা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে, আর আমার জীবনেই ঘটেছে। তাই আমার কাছে সেটা সত্যি, আর তাই সেটার বিষয় লেখা আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক।

আগেই বলে রাখি, যাঁকে নিয়ে এই ঘটনা তাঁর আসল নামটা আমি জানি না। তিনি বললেন তাঁর কোনও নামই নেই। শুধু তাই না, নাম নিয়ে একটা ছোটখাটো লেকচারই দিয়ে ফেললেন আমাকে। বললেন—

'নাম দিয়ে কী হবে মশাই? নাম একটা ছিল এককালে। সেটার আর প্রয়োজন নেই বলে বাদ দিয়ে দিয়েছি। আপনি এলেন, আলাপ করলেন, নিজের নামটা বললেন, তাই নামের প্রশ্নটা উঠছে। এমনিতে কেউ তো আসে না, আর তার মানে কারুর আমাকে নাম ধরে ডাকার প্রয়োজনও হয় না। চেনাশোনা কেউ নেই, কাউকে চিঠিপত্র লিখি না, কাগজে লেখা ছাপাই না, ব্যাঙ্কে চেক সই করি না—কাজেই নামের প্রশ্নটাই আসে না। একটা চাকর আছে, সেটাও বোবা। বোবা না হলেও সে নাম ধরে ডাকত না; বলত বাবু। ব্যস্‌ ফুরিয়ে গেল। এখন কথা উঠতে পারে আপনি কী বলে ডাকবেন। এটা নিয়েই ভাবছেন তো?...'

শেষটায় অবিশ্যি তাঁকে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বলে ডাকাই ঠিক হল। কেন, সেটা পরে সময়মতো বলছি। আগে একটু গোড়ার কথা বলে নেওয়া দরকার।

ঘটনাটা ঘটে গোপালপুরে। উড়িষ্যার গঞ্জম ডিস্‌ট্রিক্টে বহরমপুর স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্ট শহর গোপালপুর। গত তিন বছর আপিসের কাজের চাপে ছুটি নেওয়া হয়নি। এবার তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এই না-দেখা অথচ নাম-শোনা জায়গাটাতেই যাওয়া স্থির করলাম। আপিসের কাজের বাইরে আমার আরেকটা কাজ আছে, সেটা হল অনুবাদের কাজ। আজ পর্যন্ত আমার করা সাতখানা ইংরিজি রহস্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ বাজারে বেরিয়েছে। প্রকাশক বলেন বইগুলোর কাটতি ভাল। কতকটা তাঁরই চাপে নিতে হয়েছে ছুটিটা। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে একটা গোটা বই অনুবাদ করার দায়িত্ব আমার স্কন্ধে রয়েছে।

গোপালপুরে আগে কখনও আসিনি। বাছাইটা যে ভালই হয়েছে সেটা প্রথম দিন

এসেই বুঝেছি। এমন নিরিবিলি অথচ মনোরম জায়গা কমই দেখেছি। নিরিবিলি আরো এইজন্য যে, এটা হল অফ্ সীজন—এপ্রিল মাস। হাওয়া-বদলের দল এখনও এসে পৌঁছয়নি। যে হোটেলে এসে উঠেছি, তাতে আমি ছাড়া আছেন আর একটিমাত্র প্রাণী—এক বৃদ্ধ আর্মেনিয়ান—নাম মিস্টার অ্যারাটুন। তিনি থাকেন হোটেলের পশ্চিম প্রান্তের ঘরে, আর আমি থাকি পূর্ব প্রান্তে। হোটেলের লম্বা বারান্দায় ঠিক নীচ থেকেই শুরু হয়েছে বালি; একশো গজের মধ্যেই সমুদ্রের ঢেউ এসে সেই বালির উপর আছড়ে পড়ছে। লাল কাঁকড়াগুলো মাঝে মাঝে বারান্দায় উঠে এসে ঘোরাফেরা করে। আমি ডেক-চেয়ারে বসে দৃশ্য উপভোগ করি আর লেখার কাজ করি। সন্ধ্যায় ঘণ্টা দুয়েকের জন্য কাজ বন্ধ রেখে বালির ওপর হাঁটতে বেরোই।

প্রথম দু'দিন সমুদ্রের তীর ধরে পশ্চিম দিকটায় গেছি; তৃতীয় দিন মনে হল একবার পুব দিকটাতেও যাওয়া দরকার; বালির ওপর আদ্যিকালের নোনাধরা পোড়া বাড়িগুলো ভারী অদ্ভুত লাগে। মিস্টার অ্যারাটুন বলছিলেন এগুলো নাকি প্রায় তিন-চারশো বছরের পুরনো। এককালে গোপালপুর নাকি ওলন্দাজদের একটা ঘাঁটি ছিল। এসব বাড়ির বেশিরভাগই নাকি সেই সময়কার। দেয়ালের ইটগুলো চ্যাপটা আর ছোট ছোট, দরজা জানলার বাকি রয়েছে শুধু ফাঁকগুলো, আর ছাত বলতেও ছাউনির চেয়ে ফাঁকটাই বেশি। একটা বাড়ির ভিতর ঢুকে দেখেছি, ভারী থমথমে মনে হয়।

পুবদিকে কিছুদূর গিয়ে দেখলাম এক জায়গায় বালির অংশটা অনেকখানি চওড়া হয়ে গেছে, আর তার ফলে শহরটাও সমুদ্র থেকে অনেকটা পিছিয়ে গেছে। প্রায় সমস্ত জায়গাটা জুড়ে কাত করে শোয়ানো রয়েছে অন্তত শ'খানেক নৌকো। বুঝলাম এইগুলোতেই নুলিয়ারা সকালে সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরোয়। নুলিয়াগুলোকেও দেখলাম এখানে ওখানে বসে জটলা করছে, কিছু বাচ্চা নুলিয়া জলের কাছটাতে গিয়ে কাঁকড়া ধরছে, খানচারেক শুয়োর এদিকে ওদিকে ঘোঁতঘোঁত করে বেড়াচ্ছে।

এরই মধ্যে আবার দেখলাম একটা উপুড় করা নৌকোর ওপর বসে আছেন দুটি প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক। একজনের চোখে চশমা, তিনি হাতে একটি বাংলা খবরের কাগজ হাওয়ার মধ্যে ভাঁজ করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। আরেকজন বুকের কাছে হাত দুটোকে জড়ো করে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বিড়ি খাচ্ছেন। আমি একটু কাছে যেতে কাগজওয়ালা ভদ্রলোকটি সেধে আলাপ করার ভঙ্গিতে বললেন—

'নতুন এলেন?'

'হ্যাঁ...এই...দু'দিন...'

'সাহেব হোটেলে উঠেছেন?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আপনারা এখানেই থাকেন?'

ভদ্রলোক এতক্ষণে কাগজটাকে সামলাতে পেরেছেন। বললেন, 'আমি থাকি। ছাব্বিশ বছর হল গোপালপুরে। নিউ বেঙ্গলিটা আমারই হোটেল। ঘনশ্যামবাবু অবিশ্যি আপনার মতো চেঞ্জে এসেছেন।'

boiRoi.net

আমি 'আচ্ছা' বলে আলাপ শেষ করে এগোতে যাব এমন সময় ভদ্রলোক আরেকটা প্রশ্ন করে বসলেন—

'ওদিকটায় যাচ্ছেন কোথায়?'

বললাম, 'এমনি...একটু বেড়াব আর কী।'

'কেন বলুন তো?'

আচ্ছা মুশকিল তো! বেড়াতে যাচ্ছি কেন সেটাও বলতে হবে?

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আলো কমে আসছে। আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা কাল্‌চে নীল মেঘের চাব্‌ড়া জমাট বাঁধছে। ঝড় হবে নাকি?

ভদ্রলোক বললেন, 'বছরখানেক আগে হলে কিছু বলার ছিল না। যেখানে মন চায় নির্ভয়ে ঘুরে আসতে পারতেন। গত সেপ্টেম্বরে পুবদিকে নুলিয়া বস্তি ছাড়িয়ে মাইলখানেক দূরে একটি প্রাণী এসে আস্তানা গেড়েছেন। ওই পোড়োবাড়িগুলো দেখছেন, ওরই মতন একটি বাড়িতে। আমি অবিশ্যি নিজে দেখিনি সে বাড়ি। এখানকার পোস্টমাস্টার মহাপাত্র বলছিল দেখেছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সাধু-সন্ন্যাসী গোছের কেউ?'

'আদপেই না।'

'তবে?'

'তিনি যে কী, সেটা মশাই জানতে পারিনি। মহাপাত্র বললে, বাড়িটার ফাটাফুটো নাকি সব তেরপল দিয়ে ঢেকে ফেলেছে। ভেতরে কী হয় কেউ জানে না। তবে ছাতের একটা ফুটো দিয়ে বেগ্‌নে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেছে। বাড়িটা না দেখলেও লোকটাকে আমি নিজে দেখেছি দু'বার। আমি ঠিক এইখেনটেতেই বসে, আর ও হেঁটে যাচ্ছিল আমার ঠিক সামনে দিয়েই। পরনে হলদে রঙের কোট প্যান্টুলুন। গোঁফদাড়ি নেই, মাথায় গুচ্ছের ঝাঁকড়া চুল। হাঁটবার সময় কী জানি বিড়বিড় করছিল আপনমনে। এমনকী একবার যেন গলা ছেড়ে হাসতেও শুনলুম। কথা বললুম, কথার জবাব দিলে না। হয় অভদ্র, নয় পাগল। বোধহয় দুটোই। ওনার আবার একটি চাকরও আছে। তাকে অবিশ্যি সকালের দিকটায় বাজারে দেখা যায়। এমন ষণ্ডামার্কা লোক দেখিনি মশাই। মাথায় কদমছাঁট চুল। ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা। কতকটা ওই শুয়োরের মতোই। লোকটা হয় বোবা, নয় মুখ বন্ধ করে থাকে। জিনিস কেনার সময়ও মুখ খোলে না। দোকানদারকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয়। মনিব যেমন লোকই হোন না কেন, অমন চাকর যে বাড়িতে আছে, তার কাছাকাছি না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?'

ঘনশ্যাম ভদ্রলোকটিও ইতিমধ্যে উঠে পড়েছেন। বিড়িটাকে বালির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'চলুন মশাই।' দুই ভদ্রলোক তাঁদের হোটেলের দিকে রওনা দেবার আগে ম্যানেজারবাবুটি জানিয়ে গেলেন যে তাঁর নাম রাধাবিনোদ চাটুজ্যে, এবং আমি একবার তাঁর হোটেলে পায়ের ধুলো দিলে তিনি খুবই খুশি হবেন।

রহস্য গল্প অনুবাদ করে করে রহস্য সম্পর্কে যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আমার

মনে গড়ে উঠেছে সেটা তো আর নিউ বেঙ্গলি হোটেলের ম্যানেজারবাবু জানেন না! আমি বাড়ি ফেরার কথা একবারও চিন্তা না করে পুবদিকেই আরো এগোতে লাগলাম।

এখন ভাটার সময়। সমুদ্রের জল পিছিয়ে গেছে। ঢেউও অল্প। পাড়ের যেখানে এসে ঢেউ ফেনা কাটছে, তার কাছেই কয়েকটা কাক লাফালাফি করছে, ফেনাগুলো সরসর করে এগিয়ে এসে পিছিয়ে যাচ্ছে, আর তারপরেই ফেনার বুড়বুড়িতে ঠোকর দিয়ে কাকগুলো কী যেন খাচ্ছে। নুলিয়া গ্রাম ছাড়িয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর দূর থেকে ভিজে বালির ওপর একটা চলন্ত লাল চাদর দেখে প্রথমটা বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম; কাছে গিয়ে বুঝলাম সেটা একটা কাঁকড়ার পাল, জল সরে যাওয়াতে দলে-দলে তাদের বাসায় ফিরে যাচ্ছে।

আর পাঁচ মিনিট পথ যেতেই বাড়িটাকে দেখতে পেলাম। তেরপলের তাপ্পির কথা আগেই শুনেছিলাম, তাই চিনতে অসুবিধা হল না। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি শুধু তেরপল নয়, বাঁশ, কাঠের তক্তা, মরচে ধরা করুগেটেড টিন, এমনকী পেস্ট বোর্ডের টুকরো পর্যন্ত বাড়ি মেরামতের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখে মনে হল, এক যদি ছাত ভেদ করে বৃষ্টির জল না পড়ে, তা হলে এ বাড়িতে একজন লোকের পক্ষে থাকা এমন কিচ্ছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই লোকটি কোথায়?

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে মনে হল, সে যদি সত্যি ছিটগ্রস্ত হয়, আর তার যদি সত্যিই একটা ষণ্ডামার্কা চাকর থেকে থাকে, তা হলে আমি যেভাবে উগ্র কৌতূহল নিয়ে বাড়িটার দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখছি, সেটা বোধহয় খুব বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে না। তার চেয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করলে কেমন হয়? এতদূর এসে লোকটাকে একবার অন্তত চোখের দেখা না দেখেই ফিরে যাব?

এইসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ খেয়াল হল যে, বাড়ির সামনের দরজার ফাঁকটার পিছনে অন্ধকারের মধ্যে কী যেন একটা নড়ে উঠল। আর তারপরেই একটি ছোট্টখাট্টো বেঁটে লোক বাইরে বেরিয়ে এল। বুঝতে বাকি রইল না যে, ইনিই বাড়ির মালিক, আর ইনি বেশ কিছুক্ষণ থেকেই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

'আপনার হাতে যে ছ'টা আঙুল দেখছি!—হেঃ হেঃ!' হঠাৎ মিহি গলায় কথা এল।

কথাটা ঠিকই। আমার হাতে বুড়ো আঙুলের পাশে জন্ম থেকেই একটা বাড়তি আঙুল রয়েছে, যেটা কোনও কাজ করে না। কিন্তু ভদ্রলোক অতদূর থেকে সেটা বুঝলেন কী করে?

এবার আরো কাছে এলে পর বুঝলাম তাঁর হাতে রয়েছে একটা আদ্যিকালের একচোখা দুরবিন, আর সেইটে দিয়েই নির্ঘাত এতক্ষণ তিনি আমাকে স্টাডি করছিলেন।

'অন্যটা নিশ্চয়ই বুড়ি আঙুল? তাই নয় কি? হেঃ হেঃ!'

ভদ্রলোকের গলার স্বর অত্যন্ত মিহি। এত বয়সের লোকের এমন গলা আমি

কখনও শুনিনি।

'আসুন না—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?'

কথাটা শুনে আমি রীতিমতো অবাক হলাম। রাধাবিনোদবাবুর কথায় আমার লোকটা সম্পর্কে একেবারে অন্যরকম ধারণা হয়েছিল; এখন দেখছি দিব্যি খোশমেজাজি ভদ্র ব্যবহার।

আমার চেয়ে এখনও হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক। সন্ধ্যার আলোতে তাঁকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলাম না, অথচ দেখার ইচ্ছেটাও প্রবল, তাই তাঁর অনুরোধে আপত্তি করলাম না।

'একটু সাবধানে, আপনি লম্বা মানুষ, আমার দরজাটা আবার...'

হেঁট হয়ে মাথা বাঁচিয়ে ভদ্রলোকের আস্তানায় প্রবেশ করা গেল। একটা পুরনো মেটে গন্ধর সঙ্গে সমুদ্রের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, আর আরেকটা কী জানি অচেনা গন্ধ মিশে এই পাঁচমেশালি জোড়াতালি বাঁড়ির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেছে।

'বাঁদিকে আসুন। ডানদিকটা আমার—হেঃ হেঃ—কাজের ঘর।'

ডানদিকের দরজার ফাঁকটা দেখলাম একটা বড় কাঠের তক্তা দিয়ে বেশ পোক্তভাবেই বন্ধ করা রয়েছে। আমরা বাঁদিকের ঘরে ঢুকলাম। এটাকে বোধহয় বৈঠকখানা বলা চলে। এক কোণে একটা কাঠের টেবিলের ওপর কিছু মোটা মোটা খাতাপত্র, গোটাতিনক কলম, একটা দোয়াত, একটা আঠার শিশি, একটা বড় কাঁচি। টেবিলের সামনে একটা মরচে ধরা টিনের চেয়ার, একপাশে একটা বড় উপুড় করা প্যাকিং কেস, আর ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট চেয়ার। এই শেষের আসবাবটি থাকা উচিত ছিল কোনও রাজবাড়ির বৈঠকখানায়। জাঁদরেল কাঠের ওপর জাঁদরেল কারুকার্য, বসবার জায়গায় গাঢ় লাল মখমলের ওপর ফুলকারি।

'আপনি ওই বাক্সটায় বসুন, আমি চেয়ারে বসছি।'

এই প্রথম একটা খটকা লাগল। লোকটা বদ্ধ পাগল না হলেও, একটু বেয়াড়া রকমের খামখেয়ালি তো বটেই। তা না হলে একজন বাইরের লোককে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে প্যাকিং বাক্সে বসতে দিয়ে নিজে সিংহাসনে বসে?

অথচ জানলায় তেরপলের ফাঁক দিয়ে আসা সন্ধ্যার আলোতে তো তাঁর চোখে কোনও পাগলামির লক্ষণ দেখছি না। বরং বেশ একটা ছেলেমানুষি হাসিখুশি ভাব। আর সেই কারণেই লোকটার বেয়াড়া অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর ওপর কোনও বিরক্তির ভাব এল না। আমি প্যাকিং কেসটার ওপরে বসলাম।

'তারপর বলুন,' ভদ্রলোক বললেন।

কী বলব? আসলে তো কিছুই বলতে আসিনি, শুধু দেখতেই এসেছিলাম, তাই ফস করে বলুন বললে বেশ মুশকিলেই পড়তে হয়। শেষটায় আর কিছু ভেবে না পেয়ে নিজের পরিচয়টাই দিয়ে ফেললাম—

'আমি এসেছি ছুটিতে, কলকাতা থেকে। আমি, মানে, একজন লেখক। আমার নাম হিমাংশু চৌধুরী। এদিকে এসেছিলাম বেড়াতে, আপনার বাড়িটা চোখে পড়ল...'

'বেশ বেশ। পরিচয়টা পেয়ে খুশি হলাম। তবে আমার কিন্তু নাম-টাম নেই।'

আবার খটকা। নাম নেই মানে? নাম তো একটা সকলেরই থাকে; এঁর বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

কথাটা তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক নামের উপর লেকচারটা দিয়ে দিলেন। সেটা শেষ হবার পর আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, 'আমার কথাগুলো বোধহয় আপনার মনঃপূত হল না। একটা কথা তা হলে বলি আপনাকে—আমি নিজে কিন্তু মনে মনে আমার একটা নাম ঠিক করে রেখেছি। অবিশ্যি এ নামটা কাউকে বলিনি, কিন্তু আপনার কি না ছ'টা আঙুল, তাই আপনাকে বলতে আপত্তি নেই।'

আমি ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে রইলাম। ঘরে আলো ক্রমশ কমে আসছে। চাকরটাকে দেখছি না কেন? অন্তত একটা মোমবাতি বা কেরোসিনের আলো তো এই সময় ঘরে এনে রাখা উচিত।

ভদ্রলোক এবার হঠাৎ তাঁর মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে বললেন, 'আমার কানটা লক্ষ করেছেন কি?'

এতক্ষণ করিনি, কিন্তু এবার চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম।

মানুষের এরকম কান আমি কখনও দেখিনি। উপর দিকটা গোল না হয়ে ছুঁচোলো ঠিক যেমন শেয়াল কুকুরের হয়। এরকম হল কী করে?

কান দেখিয়ে আমার দিকে ফিরে ভদ্রলোক হঠাৎ আরেকটা তাজ্জব ব্যাপার করে বসলেন। তাঁর নিজের মাথার চুলটা ধরে দিলেন এক টান, আর তার ফলে সেটা হাতে খুলে এল। অবাক হয়ে দেখি—এক ব্রহ্মতালুর কাছে আর কানের পাশটাতে ছাড়া সারা মাথার কোথাও একগাছি চুল নেই। এই নতুন চেহারা, আর তার সঙ্গে মিটিমিটি চাহনিতে দুষ্টু হাসির ভাব দেখে আমার মুখ থেকে আপনা থেকেই একটা নাম বেরিয়ে পড়ল—হিজিবিজ্‌বিজ্‌!'

'এক্‌জ্যাক্টলি!' ভদ্রলোক হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলেন। 'আপনি ইচ্ছে করলে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন।'

বললাম, 'দরকার নেই। হিজিবিজ্‌বিজের চেহারা ছেলেবেলা থেকেই মনে গেঁথে আছে।'

'বেশ, বেশ, বেশ! আপনি চান তো স্বচ্ছন্দে এ নামটা ব্যবহার করতে পারেন। এমনকী নামটার আগে একটা প্রোফেসর জুড়ে দিলে আরো ভাল হয়। অবিশ্যি এটা কাউকে বলবেন না। যদি বলেন তা হলে কিন্তু—হেঃ হেঃ হেঃ...'

এই প্রথম যেন আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগল। লোকটা নিঃসন্দেহে পাগল। কিংবা বেয়াড়া রকমের ছিটগ্রস্ত। এ ধরনের লোককে বরদাস্ত করা ভারী কঠিন। সবসময়ই কী বলবে কী করবে ভেবে তটস্থ হয়ে থাকতে হয়।

দু'জনের একসঙ্গে চুপ করে থাকাটাও ভাল লাগছিল না; তাই বললাম, 'আপনার কানের ছুঁচোলো অংশটার রং একটু অন্যরকম বলে মনে হচ্ছে?'

'তা তো হবেই', ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা তো আর আমার নিজের নয়। জন্মের সময় তো আর আমার এরকম কান ছিল না।'

'তা হলে কি ওটা আপনার চুলের মতোই নকল? টানলে খুলে আসবে নাকি?'

ভদ্রলোক আবার সেই খিকখিকে হাসি হেসে বললেন, 'মোটেই না, মোটেই না, মোটেই না!'

নাঃ। লোকটা নির্ঘাত পাগল। বললাম, 'তা হলে ওটা কী?'

'দাঁড়ান। আগে আমার চাকরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। একেও হয়তো আপনি চিনতে পারবেন।'

এতক্ষণ লক্ষ করিনি; কোন ফাঁকে জানি আরেকটি লোক পিছনের দরজা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটা কেরোসিনের বাতি। এই সেই চাকর, যার কথা রাধাবিনোদবাবু বলেছিলেন।

ভদ্রলোক হাতছানি দিয়ে ডাকলে পর সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর কেরোসিনের বাতিটা রাখল। সত্যিই, এরকম ষণ্ডামার্কা লোক এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। লোকটার গায়ে একটা ডোরাকাটা ফতুয়া আর একটা খাটো করে পরা ধুতি। পায়ের গুলি, হাতের মাস্‌ল, কবজির বেড়, বুকের ছাতি, গর্দানের বহর দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। অথচ লম্বায় লোকটা পাঁচ ফুট দু-তিন ইঞ্চির বেশি নয়।

'কারুর কথা মনে পড়ছে কি আমার চাকরকে দেখে?' জিজ্ঞেস করলেন হিজিবিজ্‌বিজ্‌।

লোকটা বাতি নামিয়ে রেখে তার মনিবের দিকে ফিরে আদেশের অপেক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মিনিটখানেক তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মিলটা মনে পড়ে গেল। অবাক হয়ে বললাম, 'আরে, এ যে ষষ্ঠিচরণ!'

'ঠিক ধরেছেন, ঠিক ধরেছেন!' ভদ্রলোক খুশিতে বসে-বসেই নেচে উঠলেন।

'খেলার ছলে ষষ্ঠিচরণ হাতি লোফেন যখন তখন
দেহের ওজন উনিশটি মন, শক্ত যেন লোহার গঠন...'

অবিশ্যি ওর ওজন ঠিক উনিশ মন নয়, সাড়ে তিনের একটু বেশি। অন্তত সিক্সটি সেভেনে তাই ছিল। আর হাতি লোফাটার কথা জানি না, কিন্তু এখানে এসে অবধি ও প্রতিদিন সকালে দুটো আস্ত ধেড়ে শুয়োর নিয়ে লোফালুফি করে, এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। এই যে আমার চেয়ারটা, এটা তো ও এক হাতে তুলে নিয়ে এসেছে।'

'কোত্থেকে?'

'হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—সেটা আর নাই শুনলেন। যাও তো ষষ্ঠি—দুটো ডাব নিয়ে এসো তো আমাদের জন্য।'

ষষ্ঠি আজ্ঞা পালন করতে চলে গেল।

বাইরে মেঘের গর্জন। একটা দমকা হাওয়ায় তেরপলগুলো পটপট শব্দে নড়ে উঠল। এইবারে না উঠলে দুর্যোগে পড়তে হতে পারে।

'আমার কানটার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?' ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা আসলে একটা বনবেড়ালের কান আর আমার ওরিজিন্যাল কান মিশিয়ে তৈরি।'

কথাটা শুনে হাসিই পেয়ে গেল। বললাম, 'মেশালেন কী করে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কেন—একটা মানুষের হৃৎপিণ্ড আরেকটা মানুষের শরীরে বসিয়ে দিচ্ছে, আর একটা জানোয়ারের আধখানা মাত্র কান একটা মানুষের কানের ওপর বসিয়ে দেওয়া যাবে না?'

'আপনি কি আগে ডাক্তারি করতেন? প্লাস্টিক সার্জারি জাতীয় কিছু?'

'তা তো বটেই। করতাম কেন—এখনও করি, হেঃ হেঃ। তবে সে যেমন তেমন প্লাস্টিক সার্জারি নয়। এই যেমন ধরুন—আপনার ওই যে বাড়তি বুড়ো আঙুলটা—ওটা যদি আপনার না থাকত, তা হলে প্রয়োজনে ওটা লাগিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে হত জলের মতো সোজা।'

লোকটাকে অনেক চেষ্টা করলাম বড় ডাক্তার হিসেবে কল্পনা করতে, কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। অথচ কানটার দিকে চোখ গেলে সত্যিই ভারী অদ্ভুত লাগছিল। কী বেমালুমভাবে জোড়া লাগিয়েছে! বোঝার কোনও উপায় নেই।

ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তারি আর বিজ্ঞানের বই ছাড়া জীবনে কেবলমাত্র দুটি বই পড়েছি আমি—আবোল-তাবোল আর হ-য-ব-র-ল। আর দুটোর মধ্যেই যে ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে মনে ধরেছে সেটা হচ্ছে ওই প্রাণীগুলো—যাদের বলা হয় আজগুবি কিম্ভূত। এই যে সাধারণের বাইরে কিছু হলে বা করলে বা বললেই লোকে পাগলামি আর আজগুবি বলে উড়িয়ে দেয়, এটার কোনও মানেই হয় না। আমি ছেলেবেলা মোমবাতি চুষে খেতাম জানেন। দিব্যি লাগে খেতে। আর মাছি যে কত খেয়েছি ধরে ধরে তার কোনও গোনাগুনতি নেই।'

ষষ্ঠিচরণ ডাব নিয়ে এসেছে, তাই ভদ্রলোককে একটু থামতে হল। দুটো কলাইকরা গেলাস টেবিলের উপর রেখে তার উপর একটার পর একটা ডাব ধরে দু' হাতের তেলো দিয়ে চাপ দিতেই সেগুলো মট মট করে ভেঙে ভিতরের জল পড়ল গিয়ে ঠিক গেলাসের ভিতর। ষষ্ঠিচরণ আমাদের হাতে গেলাস ধরিয়ে দিল।

ডাবের জলে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তারি পড়ে প্লাস্টিক সার্জারিতে স্পেশালাইজ করলাম কেন বলুন তো?'

'কেন?' আমার কৌতূহল বাড়ছিল। সেটা আর কিছুই না—ভদ্রলোকের কল্পনার দৌড় কদ্দূর সেটা জানবার জন্য।

হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বললেন, 'কারণ, শুধু ছবি দেখে মন ভরত না। খালি ভাবতাম এমন জানোয়ার যদি সত্যি করে থাকত! কোথাও যে আছেই ওসব প্রাণী, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমি তাদের চাইছিলাম আমার ঘরের মধ্যে, আমার হাতের কাছে, আমার চোখের সামনে—বুঝেছেন?'

আমি বললাম, 'না মশাই, বুঝিনি। কোন সব প্রাণীর কথা বলছেন আপনি?'

'এই ধরুন—বকচ্ছপ কি গিরগিটিয়া, কি হাঁসজারু।'

বললাম, 'বুঝেছি। তারপর?'

'তারপর আর কী! শুরু করলাম গিরগিটিয়া দিয়ে। দুটোই হাতের কাছে ছিল। টিয়ার মুড়ো আর গিরগিটির ল্যাজ। ঠিক যেমন বইয়ে আছে। প্রথম বাজিতেই

কিস্তিমাত। বেমালুম জোড়া লেগে গেল। কিন্তু জানেন—'

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'বেশিদিন বাঁচল না। খেতেই চায় না কিচ্ছু! না খেলে বাঁচবে কী করে? আসলে যা লেখা আছে সেটাই ঠিক—শরীরে শরীরে মিলে গেলেও মনের সন্ধিটা হতে চায় না। তাই এখন ধড়ে-মুড়ো সন্ধিটা ছেড়ে অন্য এক্সপেরিমেন্ট ধরেছি।'

ভদ্রলোক হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ভাগ্যে ডাব খেতে দিয়েছে! চা বিস্কুট হলে সাহস করে মুখে পোরা যেত না। ষষ্ঠিচরণ কোথায় গেল কে জানে! একটা খুটখাট শব্দ পাচ্ছি। যেদিক থেকে আসছে, তাতে মনে হয় হয়তো ভদ্রলোক যেটাকে তাঁর কাজের ঘর বললেন, তার দরজাটা খোলা হচ্ছে।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। মেঘের গুড়গুড়ুনিটাও ভাল লাগছে না। আর বসা যায় না। ফিরে গিয়ে কাজে বসতে হবে। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লাম।

'চললেন? কিন্তু আপনার কাছে যে একটা জিজ্ঞাসা ছিল।'

'বলুন—'

'ব্যাপার কী জানেন—সবই জোগাড় হয়েছে—শজারুর কাঁটা, রামছাগলের শিং, সিংহের পিছনের দুটো পা, ভাল্লুকের লোম, সবকিছুই। কিন্তু খানিকটা অংশ যে আবার মানুষের—আর সেখানে তো ছবির সঙ্গে মিল থাকা উচিত, তাই নয় কি? সেরকম মানুষ আপনার চোখে কেউ পড়েছে কি না জানতে পারলে সুবিধে হত।'

এই বলে ভদ্রলোক তাঁর টেবিলের উপর রাখা খাতাপত্রের নীচ থেকে একটা আদ্যিকালের আবোল-তাবোল বার করে সেটার একটা পাতা খুলে আমার চোখের সামনে ধরলেন। চেনা ছবি অবশ্যই। হাতে মুগুর নিয়ে একটা অদ্ভুত প্রাণী একটি পলায়নরত গোবেচারা মানুষের দিকে কটমট করে চেয়ে আছে—

ভয় পেয়ো না ভয় পেয়ো না—তোমায় আমি মারব না,
সত্যি বলছি তোমার সঙ্গে কুস্তি করে পারব না...

'কেমন চমৎকার হবে বলুন তো এমন একটি প্রাণী তৈরি করতে পারলে! কিছুই না—তোড়জোড় সব হয়েই আছে, তলার দিকের খানিকটা জোড়াও লেগে গেছে, এখন দরকার কেবল একটি এইরকম চেহারার মানুষ।'

আমি বললাম, 'অত গোল গোল চোখ কি মানুষের হয়?'

'আলবত!' ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। 'চোখ তো গোলই হয়! চোখের পাতা দিয়ে গোলের অনেকটা ঢাকা থাকে বলে অতটা গোল মনে হয় না।'

আমি দরজার দিকে রওনা দিলাম। একে পাগল, তায় নাছোড়বান্দা, তায় আবার কথার ঝুড়ি।

'ঠিক আছে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্, কাউকে নজরে পড়লে জানাব।'

'অতি অবশ্যই জানাবেন। বড্ড উপকার হবে। আমি অবিশ্যি নিজেও খুঁজছি। আপনি কোথায় উঠেছেন সেটা বললেন না তো?'

শেষের প্রশ্নটা না শোনার ভান করে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। আর বেরিয়েই দৌড়। ভিজতে আপত্তি নেই, কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে যে বালি ওড়ে সেটা নাকে চোখে ঢুকে বড় বিশ্রী অসুবিধার সৃষ্টি করে।

কোনওরকমে হাত দুটো মুখের সামনে ধরে চোখটাকে বাঁচিয়ে হোটেলে যখন ফিরেছি তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে দেখি বাতি জ্বলছে না। বারান্দায় বেরিয়ে হাঁক দিয়ে বেয়ারাকে ডাকতে যাব, কিন্তু সেটার আর প্রয়োজন হল না। বেয়ারা মোমবাতি নিয়ে আমার ঘরের দিকেই আসছে। কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করতে বলল, বেশি ঝড় বৃষ্টি হলে বাতি নিভে যাওয়াটা নাকি গোপালপুরে একটা সাধারণ ঘটনা।

আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে খাটে বসে টিমটিমে আলোকে লেখার কাজ শুরু করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটছে। মনটা বারবার চলে যাচ্ছে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজের দিকে। তিনশো বছরের পুরনো ঝুরঝুরে বাড়িতে জোড়াতালি দিয়ে (এখানেও সেই আবোল-তাবোলের থুড়থুড়ে বুড়িটার কথাই মনে পড়ে!) কীভাবে রয়েছে লোকটা! বদ্ধ পাগল না হলে কি কেউ এরকম করে? আর ষষ্ঠিচরণ? কোত্থেকে এমন এক ষাঁড়ের মতো চাকর জোগাড় করলেন তিনি? আর সত্যিই কি তিনি এই পুবদিকের বন্ধ ঘরটায় একটা অদ্ভুত কিছু করছেন? লোকটার কথার কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে? পুরোটাকেই অবশ্য পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু গোলমাল করছে ওর ওই কান দুটো। ওগুলো যে শুধু বেমালুম জোড়া হয়েছে তা নয়; আসবার সময় কেরোসিনের আলোতে লক্ষ করেছি একটা কানের ছুঁচলো অংশটাতে আবার একটা ফোস্‌কা পড়েছে। তার মানে সে কান শরীরেরই অংশ, আর শরীরের অন্য সব জায়গার মতো সেখানেও শিরা আছে, স্নায়ু আছে, রক্ত চলাচল আছে, সবই আছে।

সত্যি, যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে যে, ওই কানটা না থাকলে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

পরদিন সকালে সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে দেখি রাতারাতি মেঘ কেটে গেছে। চা খেতে বসে হিজিবিজ্‌বিজের কথা মনে হতে হাসি পেল। ব্যাপারটা আর কিছুই না—আবছা অন্ধকারে কেরোসিনের আলোয় অর্ধেক দেখেছি, অর্ধেক কল্পনা করেছি। হোটেলে ফিরে এসেও পেয়েছি সেই একই অন্ধকার, তাই মন থেকে খটকার ভাবটা কাটবার সুযোগ পায়নি। আজ বালির উপর সকালের রোদ আর শান্ত সমুদ্রের চেহারা দেখে মনে হল লোকটা খ্যাপা ছাড়া আর কিছুই না।

পায়ের তলায় গোড়ালির কাছে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করছিলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম একটা জায়গায় ছোট্ট একটা কাটার দাগ। বুঝলাম কাল অন্ধকারে বালির উপর দিয়ে দৌড়ে আসার সময় ঝিনুক জাতীয় কিছুর আঁচড় লেগেছে। সঙ্গে ডেটল আয়োডিন কিছুই আনিনি, তাই ন'টা নাগাদ একবার বাজারের দিকে গেলাম।

বাজারে যাবার রাস্তাটা নিউ বেঙ্গলি হোটেলের সামনে দিয়ে গেছে। হোটেলের

সামনেই বারান্দায় কালকের ঘনশ্যামবাবুকে দেখলাম একজন ফেরিওয়ালার কাছ থেকে একটা প্রবাল নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখছেন। আমার পায়ের আওয়াজ শুনে ভদ্রলোক মুখ তুললেন, আর তুলতেই আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করে উঠল।

এ যে সেই আবোল-তাবোলের মুখ—যে মুখের খোঁজ করছেন ওই উন্মাদ প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্!

কোনও সন্দেহ নেই: সেই থ্যাবড়া নাকের নীচে দু'পাশে ছিটকে থাকা লম্বা পাকা গোঁফ, লম্বা গলার দু'পাশে ঠিক ছবির মতো করে বেরিয়ে থাকা শিরা, এমনকী চ্যাপটা থুতনির নীচে কয়েক গোছা মাত্র চুলের ছাগলা দাড়িটা পর্যন্ত। আসলে কাল কেন জানি লোকটার হাবভাব পছন্দ হয়নি বলে ওর মুখের দিকে ভাল করে তাকাইনি। আজকে চোখাচুখিটা হল বটে, আর আমি একটা নমস্কারও করলাম, কিন্তু ভদ্রলোক দেখলাম সেটা গ্রাহ্যই করলেন না। ভারী অভদ্র।

কিন্তু তাও লোকটার জন্য দুশ্চিন্তা হল। ওই পাগলের খপ্পরে কখনওই পড়তে দেওয়া যায় না একে। হিজবিজ্‌বিজ্ বা তার চাকর যদি একে দেখে, তা হলে নির্ঘাত বদলদাবা করে নিয়ে যাবে ওই ঝুরঝুরে বাড়িতে। আর তারপর যে কী করবে সেটা মা গঙ্গাই জানেন।

ঠিক করলাম বাজার ফেরতা একবার রাধাবিনোদবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বলব। তাঁকে সাবধান করে দেব তাঁর হোটেলের একমাত্র অতিথিকে যেন তিনি একটু চোখে চোখে রাখেন।

কিন্তু ডেটল কিনতে কিনতেই আমার সঙ্কল্পটা যেন আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেল। রাধাবিনোদবাবুকে যেসব উদ্ভট কথা আমাকে বলতে হবে, সেগুলো কি তিনি বিশ্বাস করবেন? মনে তো হয় না। এমনকী সেসব শুনে শেষটায় হয়তো আমাকেই পাগল ঠাওরাবেন। তা ছাড়া আমি যে তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করে হিজিবিজ্‌বিজের বাড়ি গেছি, সেটাও নিশ্চয় তাঁর মনঃপূত হবে না।

ফেরার পথে আরেকবার ঘনশ্যামবাবুকে দেখে মনে হল—আমার চোখে যাকে ওই ছবির মতো মনে হচ্ছে, হিজিবিজ্‌বিজের চোখে সেটা নাও হতে পারে। সুতরাং যতটা ভয়ের কারণ আছে বলে ভাবছি, আসলে হয়তো ততটা নেই। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে এদের কিছু না বলা, আর প্রোফেসরকেও ঘনশ্যামবাবু সম্বন্ধে কিছু না বলা। এবার থেকে শুধু পশ্চিমদিকটায় বেড়াতে যাব, আর বাকি সময়টা হোটেলের ঘরে বসে লেখার কাজ করব।

হোটেলে ফিরতেই বেয়ারা বলল একটি ভদ্রলোক আমার খোঁজে এসেছিলেন। আমাকে না পেয়ে তিনি নাকি একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

অত্যন্ত খুদে খুদে প্রায় পিঁপড়ের মতো অক্ষরে লেখা চিঠিটা হচ্ছে এই—

প্রিয় ষড়াঙ্গুল মহাশয়,

আজ সন্ধ্যাবেলা অবশ্যই একবার আমার গৃহে আসিবেন। সিংহের পশ্চাৎভাগের সহিত শজারুর কাঁটা এবং ভাল্লুকের লোম নিখুঁতভাবে জোড়া লাগিয়াছে। মুদ্‌গরও

একটি তৈয়ার হইয়াছে চমৎকার। শৃঙ্গ তিনটি মস্তকের অপেক্ষায় আছে। এখন শুধুমাত্র মস্তক ও হস্তদ্বয় সংগ্রহ হইলেই হয়। ষষ্ঠিচরণ জনৈক ব্যক্তির সন্ধান আনিয়াছে; মূল চিত্রের সহিত তাহার নাকি যথেষ্ট সাদৃশ্য। আশা করি আজই আমার পরীক্ষা সফল হইবে। অতএব সন্ধ্যায় একবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় পদার্পণ করিলে যারপরনাই আহ্লাদিত হইব।

ইতি ভবদীয়
এইচ. বি. বি.

মনে পড়ল বাড়ির নাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাখার কথাটা হ-য-ব-র-ল-তে হিজিবিজ্‌বিজ্‌ই বলেছিল। চিঠিটা পড়ে মনে আবার দুশ্চিন্তা দেখা দিল, কারণ মন বলছে ষষ্ঠিচরণ হয়তো ঘনশ্যামবাবুকেই দেখেছে।

সারা দুপুর যতদূর সম্ভব মন দিয়ে লেখার কাজ করলাম। বিকেলের দিকে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে দেখতে দেখতে মনটা অনেকটা হালকা হয়ে এল। উত্তর-পশ্চিম থেকে হাওয়া এসে এগিয়ে আসা ঢেউগুলোর গায়ে লাগছে, আর তার ফলে ঢেউয়ের মাথার ফেনাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ লাগছে দেখতে।

ছ'টা নাগাদ হঠাৎ দেখি রাধাবিনোদবাবু কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব নিয়ে বালির উপর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আমাদের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছেন। ভদ্রলোক কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—

'আমার সেই গেস্টটিকে কি এদিক দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছেন?'

'কে, ঘনশ্যামবাবু?'

'আরে হ্যাঁ মশাই। কাল যেখানে ছিলুম আমরা, সেখানেই ওয়েট করার কথা আমার জন্য। এখন এসে দেখছি নেই। কাছাকাছির মধ্যে একটা লোক নেই যাকে জিজ্ঞেস করি। এদিকে আমার হোটেলেও হাঙ্গামা—আমার সোনার ঘড়িটি চুরি গেছে—চাকরটাকে জেরা করতে দেরি হয়ে গেল। আপনার এদিক দিয়ে যায়নি বোধহয়?'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম।

'না, এদিক দিয়ে যায়নি', আমি বললাম, 'তবে একটা সন্দেহ হচ্ছে আমার। একটা জায়গায় গেলে হয়তো খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। আপনার হাতের লাঠিটা বেশ মজবুত তো?'

রাধাবিনোদবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'লাঠি? হ্যাঁ...তা...লাঠি তো আমার সেই ঠাকুরদার...কাজেই...'

আমার সঙ্গে আর কিছুই নেই—একটা করাত মাছের দাঁত কিনেছিলাম প্রথম দিন এসেই, সেইটে সঙ্গে নিয়ে নিলাম। অন্য হাতে নিলাম আমার টর্চটা।

পুবদিকে যাচ্ছি দেখে রাধাবিনোদবাবু ধরা গলায় বললেন, 'নুলিয়া বস্তি ছাড়িয়ে যাবেন কি?'

'হ্যাঁ। তবে বেশিদূর নয়—মাইলখানেক।'

সারা রাস্তা রাধাবিনোদবাবু শুধু একটি কথাই বার তিনেক বললেন—'কিছুতেই বুঝতে পারছি না মশাই।'

প্রায় দেড় মাইল পথ এক প্রৌঢ়কে সঙ্গে নিয়ে বালির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে লেগে গেল ঘণ্টাখানেক। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়ির কাছ অবধি না যাওয়া পর্যন্ত তাতে কেউ আছে কি না বোঝা অসম্ভব। বাড়িটার দিকে যতই এগোচ্ছি ততই দেখছি রাধাবিনোদবাবুর উৎসাহ কমে আসছে। শেষটায় দশ হাত দূরে পৌঁছে হঠাৎ একেবারে থেমে গিয়ে বললেন, 'আপনার মতলবটা কী বলুন তো?'

বললাম, 'অ্যাদ্দুরই যখন এলেন, তখন আর মাত্র দশটা হাত যেতে আপত্তি কীসের?'

অগত্যা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন আমার পিছন পিছন।

বাড়ির সামনে এসে টর্চ জ্বালতে হল, কারণ ভিতরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কালকের কেরোসিনের বাতি এতক্ষণে জ্বলে যাবার কথা, কিন্তু জ্বলেনি।

সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে টর্চের আলোতে প্রথমেই দেখলাম একটা লোক মাটিতে হুমড়ি দিয়ে পড়ে আছে। লোকটা মরেনি, কারণ তার বিশাল বুকটা নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ওঠানামা করছে।

'এ যে সেই চাকরটা!' ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠলেন রাধাবিনোদবাবু।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ষষ্ঠিচরণ।'

'আপনি নামটাও জানেন নাকি?'

এ কথার উত্তর না দিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলাম। ঘর খালি। প্রোফেসরের কোনও চিহ্নই নেই। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম কাজের ঘরের দিকে।

দরজাটা অর্ধেক খোলাই ছিল। ষষ্ঠিচরণকে ডিঙিয়ে তবে ভেতরে ঢুকতে হল।

বৈঠকখানার মতোই ঘরের আয়তন। একদিকে টেবিলের উপর স্তূপীকৃত সরঞ্জাম—শিশি, বোতল, কাঁটাছুরি, ওষুধপত্র ইত্যাদি। একটা উগ্র গন্ধে ঘরটা ভরে রয়েছে। এ গন্ধ আমি চিনি। ছেলেবেলায় চিড়িয়াখানায় জন্তুর খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে এ গন্ধ পেয়েছি।

'আরে—সে লোকটার পাঞ্জাবিটা রয়েছে দেখছি এখানে!' রাধাবিনোদবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

আজ সকালে পাঞ্জাবিটা আমিও দেখেছি। তিন কোয়ার্টার হাতা ব্রাউন রঙের পাঞ্জাবি, বুকে সাদা বোতাম। এটা যে ঘনশ্যামবাবুরই পাঞ্জাবি তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আর এই পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে এই ছমছমে অবস্থাতেও রাধাবিনোদবাবু চমকে উঠে হাঁফ ছাড়লেন। তিনি তাঁর সোনার ঘড়ি ফিরে পেয়েছেন।

'কিন্তু এখানে এসব কী হচ্ছে বলুন তো! কীসের সরঞ্জাম ওগুলো? পাঞ্জাবি রয়েছে, পকেটে ঘড়ি রয়েছে, কিন্তু সে ব্যাটা মানুষটা গেল কোথায়? আর সে বুড়োটাই বা কোথায় গেল?'

বললাম, 'বাড়ির ভিতরে নেই সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। চলুন বাইরে।'

ষষ্ঠিচরণ এখনও অজ্ঞান। তাকে আবার ডিঙিয়ে পেরিয়ে আমরা বাড়ির বাইরে বালির উপর এলাম। এবারে সমুদ্রের দিকে চাইতেই আবছা অন্ধকারে একটা মানুষকে দেখতে পেলাম। সে এইদিকেই আসছে। আরেকটু কাছে আসতে হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে তাঁর উপর ফেললাম। প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্‌।

'ষড়াঙ্গুল মশাই কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি হিমাংশু চৌধুরী।'

'আরেকটু আগে এলেন না!' ভদ্রলোক যেন গভীর আক্ষেপের সঙ্গে কথাটা বললেন।

'কেন বলুন তো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ও তো চলে গেল! ছবির মতো মানুষ পেলাম। এক ঘণ্টায় জোড়া লেগে গেল, দিব্যি চলে ফিরে বেড়াল, পরিষ্কার কথা বলল, ষষ্ঠিচরণ ভয় পাচ্ছিল বলে ওর মাথায় মুগুরের বাড়ি মারল, আর তারপর চলে গেল সোজা সমুদ্রের দিকে। একবার ভাবলুম ডাকি, কিন্তু নাম তো নেই, কী বলে ডাকব!...মানুষের মাথা, সিংহের পা, শজারুর পিঠ, রামছাগলের শিং...অথচ জলে যে গেল কেন সেটা বুঝতেই পারলাম না...'

কথাটা বলতে বলতে ভদ্রলোক তাঁর অন্ধকার বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন। আমার হাতের টর্চটা এতক্ষণ তাঁর উপর ফেলা ছিল, এখন হাতটা নীচে নামতে চোখে পড়ল বালির উপর পায়ের ছাপ। টাটকা পায়ের ছাপ। পা তো নয়, থাবা।

ছাপ ধরে আলো ফেলে এগিয়ে গেলাম। ক্রমে ভিজে বালি এল, তাতে ছাপ আরো গভীর। কাঁকড়ার গর্তের পাশ দিয়ে, অজস্র ঝিনুকের উপর দিয়ে থাবার ছাপ ক্রমে জলের দিকে গিয়ে সমুদ্রে হারিয়ে গেছে।

এতক্ষণে রাধাবিনোদবাবু কথা বললেন।

'সবই তো বুঝলুম। ইনি তো বদ্ধ পাগল, আপনি হয়তো হাফ-পাগল, কিন্তু আমার হোটেলের বাসিন্দা ওই বাটপাড়টা গেল কোথায়?'

হাত থেকে করাত মাছের দাঁতটা জলে ফেলে দিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়িয়ে বললাম, 'সেটা না হয় পুলিশকে তদন্ত করতে বলুন। পাঞ্জাবিটা যখন এখানে পাওয়া গেছে, তখন এখানেই দেখতে বলুন। তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, রহস্যের কূলকিনারা করতে গিয়ে পুলিশবাবাজিরও শেষটায় না আমার দশাই হয়—অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়।'